আনাতোলি আলেক্সিন

ভয়ংকর রোমহর্ষক ঘটনা

আলিক ডিটেকিনের ডিটেকটিভ কাহিনি

অনুবাদ : ননী ভৌমিক

মন্ডাজ

আমার কিশোর পাঠকদের কাছে

আমার শেষ দিককার একটি কাহিনি শুরু করেছিলাম এই ভূমিকা দিয়ে: 'এ পথটা আমার ঠোঁটস্থ। ঠিক সেই কবিতার মতো যা কখনও মুখস্থ না-করলেও সারাজীবন মনে থেকে যায়। চোখ বুজে আমি পাড়ি দিতে পারি পথটা, যদি অবশ্য ফুটপাথে লোক না-থাকত, রাস্তায় না-ছুটত বাস, মোটর গাড়ি।'

মাঝে মাঝে ছেলেপিলেদের সঙ্গে বেরোই, সাত সকালেই তারা ছোটে রাস্তাটা দিয়ে... আমার মনে হয় এই বুঝি চার-তলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মা হাঁকবেন: 'টেবিলে তোর জলখাবার পড়ে রইল!' তবে আজকাল আমার অমন ভুল বড়ো হয় না, আর যদিও-বা হয় চার-তলা থেকে ডাকাডাকি করার মানেটা কী! আমি তো আর এখন ইস্কুলের ছেলে নই।

মনে আছে একদিন আমার সেরা বন্ধু, ভালেরির সঙ্গে কেন-জানি মেপে দেখেছিলাম বাড়ি থেকে ইস্কুলে যেতে কয় কদম লাগে। এখন আমার পদক্ষেপ দিতে হয় কম: পা তো বেড়ে গেছে। কিন্তু রাস্তাটা থেকে গেছে লম্বাই, কেননা এখন আর আগের মতো ছুটে ছুটে হাঁটি না। বয়স হলে লোকের পদক্ষেপ একটু মন্থর হয়ে আসে, আর যত বয়স বাড়ে তাড়াহুড়োর ইচ্ছে ততই কমে যায়...

আগেই বলেছি, প্রায়ই সকালে ছোটোদের সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার এই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটি। ওদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি... অবাক হয়ে যায় তারা: 'কাউকে খুঁজছেন? হারিয়ে গেছে কেউ?' সত্যিই তো, আমি যেটা হারিয়েছি সেটা তো আর ফিরে পাবার নয়, তবে ভোলবার জিনিসও নয়: সে আমার ইস্কুলের দিনগুলো।

তবে, না— তারা শুধু স্মৃতি হয়ে নেই, তারা বেঁচে রয়েছে আমার মধ্যে।

হ্যাঁ, অবিস্মরণীয় শৈশবের যা কিছু অপরূপ তা সবই বুকে করে রেখেছি।

যেমন মনে আছে, বছর দশ বয়সে আমি একটা মোটামতো উপন্যাস লিখে ফেলি। নির্ভয় সব গোয়েন্দাদের কীর্তি-কাহিনি ছিল তাতে, ধূর্ত দুর্বৃত্তদের সমস্ত অপরাধ তারা ফাঁস করে। ডিটেকটিভ কাহিনি সেটা।

পরে শুরু করলাম কবিতা লিখতে। 'পাইয়োনিয়র প্রাভদা'য় তা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ফলে দেশের নানা কোণের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। আমার কবিতা পড়ত তারা। চিঠি পাঠাত।

তারপর শুরু হল যুদ্ধ। কাজ নিলাম 'ক্রেপস্ত অবোরোনি' (প্রতিরক্ষার দুর্গ) পত্রিকায়। তখনও আমার আঠারো বছর হয়নি, আর দৈনিক পত্রটির দায়িত্বশীল সেক্রেটারির পদ নিতে হল; তবে যুদ্ধের সময় তো লোকে ঝট ঝট করে বেড়ে ওঠে। অ্যালুমিনিয়ম

কারখানাতেও কাজ করেছি যেখানে 'ডানাওয়ালা ধাতুর' জন্ম হয়— বেপরোয়া জঙ্গি আর বোমার বিমান হয়ে তা পরে আকাশ-যুদ্ধ চালিয়েছে হিটলারদের সঙ্গে...

যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করি। ইচ্ছে ছিল কবিতা রচনা চালিয়ে যাব। কিন্তু একবার, একেবারে হঠাৎ লিখে ফেললাম ছোটোদের জন্যে তিন-পাতার এক গল্প। আমাদের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সামুইল মারশাক সেটি পড়লেন (সেটাও হঠাৎ!) এবং বলে উঠলেন: 'আরে, আপনি যে শিশু সাহিত্যিক!' মারশাকের এ উক্তি মান্য করে আমি শিশু সাহিত্য রচনায় হাত দিলাম...

লেখাগুলো প্রধানত হাস্যরসের... কেউ কেউ ভাবে 'মজার' গল্প আর 'হালকা' গল্প বুঝি একই জিনিস। আসলে হাস্যরস, চিত্তাকর্ষকতা হল অতি গুরুতর সমস্যাকে কিশোরের চেতনায় পৌঁছে দেবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ।

আমার 'সাশা আর শুরা', 'সেভা কতলভের অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার', 'সাত-তলা বলছি!', 'চিরন্তন ছুটির দেশ', 'কলিয়ার চিঠি ওলিয়াকে, ওলিয়ার চিঠি কলিয়াকে', 'একত্রিশ দিন' কাহিনিগুলি লেখার সময় আমি চেয়েছিলাম যেন আমার কিশোর পাঠক-পাঠিকারা তা পড়ে প্রাণ খুলে হাসে, সেই সঙ্গে জীবনের গুরুতর সমস্যার কথাও ভাবে।

তারপর... তারপর হঠাৎ একদিন মনে পড়ল আমার দশ বছর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাসটির কথা। আরও একটি ডিটেকটিভ গল্প লেখার ইচ্ছে হল আমার, তবে নিজের নামে নয়, ইস্কুলের ছাত্র আলিক ডিটেকিনের নামে। লেখার সময় আমার প্রথম রচনাটির কথা মনে রাখতে চেয়েছি। আমার ছেলেবেলাকার মতো আলিক ডিটেকিনও গল্প লেখে একটু বীর রসের আধিক্য দিয়ে, ভাষার ঘনঘটা জমিয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার যা মনে হয়েছিল, ওরও তেমনি মনে হচ্ছে, এতে রচনা হয়ে উঠবে 'খাঁটি' ডিটেকটিভ।

তবে 'ভয়ংকর রোমহর্ষক ঘটনা'র মর্মবস্তুটা শুধু মজার নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে... অন্তত আমি চেয়েছিলাম তাই হোক। ইচ্ছেটা কি কাজে পরিণত করতে পেরেছি? তবে সে রায় তো দেবে তোমরা, আদরের পাঠকেরা। বইটা তোমাদের বিচারালয়ে সোপর্দ করলাম।

আনাতোলি আলেক্সিন

আনাতোলি আলেক্সিন

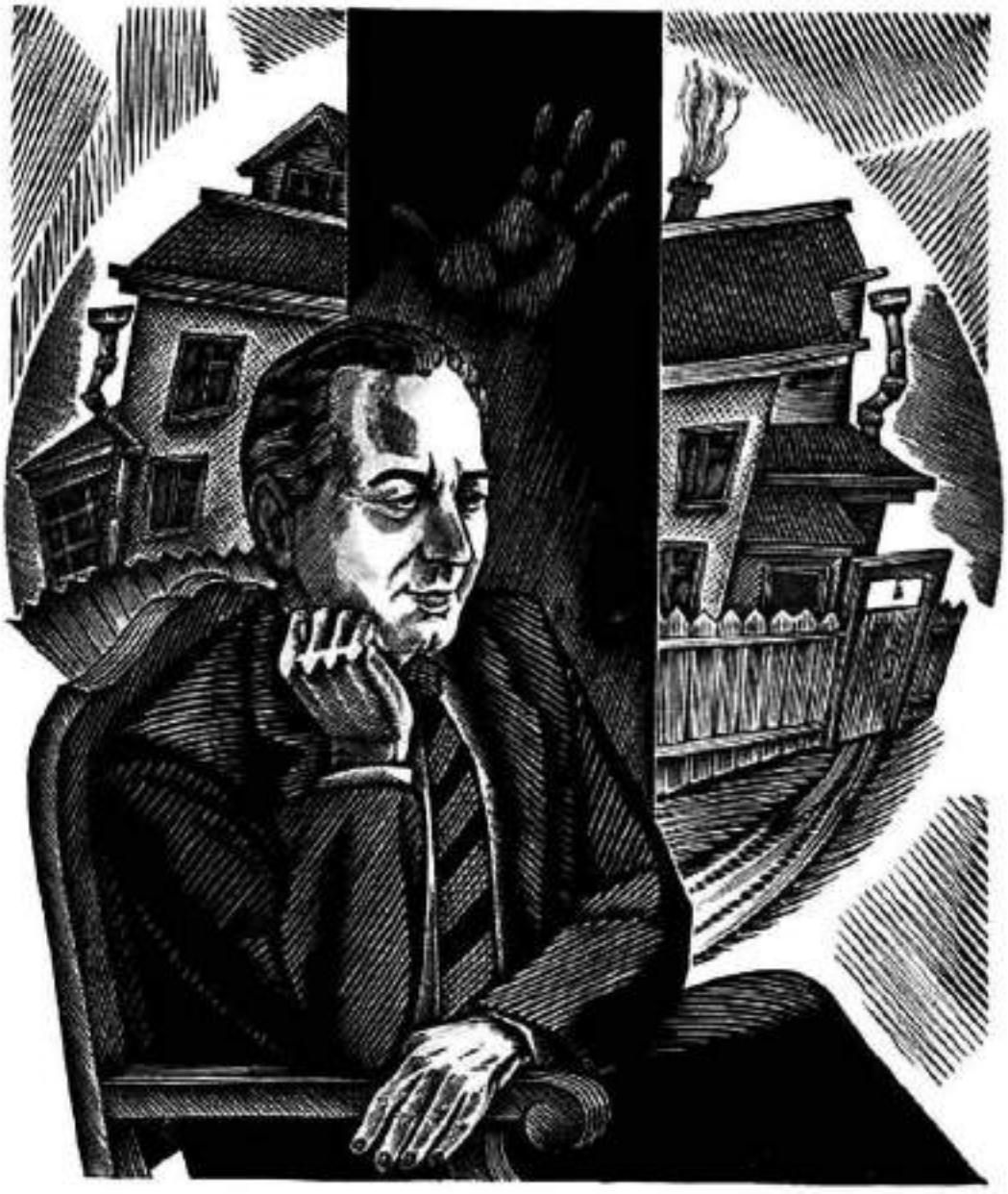

লেখকের কথা

নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে এক ইঞ্জিনিয়র সংসারে আমার জন্ম হয় ঠিক এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়। মিলমিশ পরিশ্রমী সংসার, আমি বাড়ির শেষ ছেলে। প্রথম ছেলে হল আমার দাদা কত্তিয়া। ছেলে বলতে আমরা মোট দুজন। কত্তিয়াকে অবশ্য এখন ছেলে বলা মুশকিল, কেননা সে আজকাল দাড়ি কামায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

বাপ-মায়েরা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন ভালোই; কত্তিয়া তো বিশ্ববিদ্যালয়েই যায়, আমিও ইস্কুলে পড়ছি।

আমাদের দু-ভাইয়ের স্বভাব ছিল একেবারেই আলাদা। এখনও একেবারেই আলাদাই আছে, তাহলেও 'ছিল' বললাম এই জন্যে যে লেখকের কথা সবসময়ই লেখা উচিত অতীত কালে, স্মৃতিকথার মতো। দাদার ঝোঁক টেকনিকের দিকে, আমি ভালোবাসতাম ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস পড়তে। তারপর একটু বয়স বাড়তেই হঠাৎ নিজেরই লেখবার শখ হল।

ছোটোতে গল্প শুনিয়ে নিয়ে সাহিত্যপ্রীতি জাগাবার মতো কোনো বুড়ি আয়া আমার ছিল না, যেমন ছিল কবি পুশকিনের। মা নিজেই সংসারের কাজ করতেন, তাই আয়া বা ঝি আমাদের ছিল না।

তাহলেও ডিটেকটিভ গল্পের ভবিষ্যৎ লেখক হিসেবে আমার ওপর মস্ত প্রভাব ফেলেছেন আমার মা-বাবা।

আমি যখন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন মা আমার ইস্কুলের জুতো রাখার থলিতে সেলাই করে দিয়েছিলেন আমার উপাধি 'ডিটেকিন'।

থলেটা খুবই সাধারণ, কিন্তু আমার জীবনে তার ভূমিকা অসীম! নিয়তির এমনই নির্বন্ধ যে লেখাটার শেষ দুই অক্ষর উঠে গিয়েছিল: হয়তো পচে গিয়েছিল সুতোগুলো, কিংবা হয়তো এই জন্যে যে জুতো রাখার ঘরে মাঝে মাঝেই যে চরম লড়াই লেগে যেত অল্পক্ষণের জন্যে, তাতে জুতো রাখার থলিটা হত আমার হাতিয়ার। সে যাই হোক, আমার উপাধির মধ্যে টিকে রইল শব্দ প্রথম দুটি অক্ষর: 'ডিটে...'।

তা দেখে 'ডিটেকটিভের জুতো!' বলে চেঁচিয়েছিল একবার উঁচু ক্লাসের এক ছাত্র।

সেই শুরু: আমার ডাকনাম জুটল 'ডিটেকটিভ'। আর থলেয় মা যদি আমার উপাধি সেলাই করার কথা না-ভাবতেন, তাহলে কি আর এটা হত?

তবে মা-বাবার প্রভাব শুধু এইটুকুনই নয়। প্রায়ই এঁরা আমার কাছ থেকে দলামোচড়া ডিটেকটিভ বই কেড়ে নিতেন। বলতেন, 'যত বাজে সময় নষ্ট করছিস!' পরে কিন্তু বইটা পাওয়া যেত হয় মায়ের বালিশের নীচে, নয়তো-বা বাবার

পোর্টফোলিয়োতে। এইভাবে তাঁদের কল্যাণে আমি টের পেলাম যে সমস্ত স্বাভাবিক লোকই ডিটেকটিভ বই ভালোবাসে, তবে অনেকেই ভালোবাসে গোপনে। আর গোপন ভালোবাসা যে সবচেয়ে মনোহর আর জোরালো, সে তো সবাই জানে।

এইভাবেই শুরু, হল আমার রচনা। মা-বাপ ছিলেন বিরুদ্ধে: 'বাজে সময় নষ্ট।' তখন অতীতের যত বড়ো বড়ো শিল্পী, সুরকার, লেখক বাপের ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিল বলে আমার জানা ছিল, তা বললাম। তাতে কাজ হল।

বাবা বললেন: 'বেশ, একটা বিদেশি ভাষা শেখা, কি হিতকর কোনো বই পড়া, বা ধরা যাক খেলাধূলায় যে সময়টা লাগাতে পারতিস, তা বাজে খরচে তোর যদি কষ্ট না-হয়, তাহলে কর তোর যা খুশি। তবে আমিও একজন বিখ্যাত লোকের দৃষ্টান্ত দেব।'

এই বলে তিনি কবি লেরমন্তভের প্রথম খণ্ডটা নিয়ে দুটো কবিতা পড়ে শোনালেন। বললেন:

'এ কবিতা উনি লিখেছিলেন চোদ্দো বছর বয়সে। তুই এখন তার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোটো। মাত্র দেড়। আর যদি ধরি যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, তাহলে বলতে হয় তুই সমবয়সি।'

'বেশ তো, কী হল তাতে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হল এই যে,' বললেন বাবা, 'আঙুল চুষে গল্প বেরোয় না। লিখতে বসার আগে লোকের চরিত্র জানতে হয়। আর প্লট! সেটা আসে খাস জীবন থেকেই।'

নিজেদের বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, মাস্টারদের চরিত্র অধ্যয়ন করতে লাগলাম আমি। তবে খাস জীবনটা আমায় কোনো প্লট জোগাতে চাইছিল না।

তারপর হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল...

সত্যিসত্যিই যা ঘটল তার চেয়ে ভয়ংকর ঘটনা আমি ভাবতেও পারতাম না। আর তার আগাগোড়া সবটার রহস্য ভেদ করে প্রমাণ করলাম যে, লোকে আমায় ডিটেকটিভ নাম দিয়েছে খামোখা নয়!...

১ম পরিচ্ছেদ

যাতে পরিচয় হবে কাহিনির নায়কদের সঙ্গে, যারা সবাই অবশ্য নায়ক হয়ে উঠবে না

গত বছর যখন আমাদের ক্লাসে সাহিত্যচক্র গড়া হচ্ছিল তখন কেউ ভাবতে পারেনি তা থেকে কী ঘটবে। কী গোপন, ভয়াবহ একটা ঘটনা...

তবে আগেই লাফিয়ে না-গিয়ে আমি সবটা পরপর বলে যাই, যদিও লাফিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। বইটা সব শেষ করলে আপনারা আমার কথা সহজে বুঝবেন...

যাই হোক, সবটাই শুরু হয় খুবই সাধারণ একটা ক্লাসে, সাধারণ একটা পাঠের সময়। ঘরটা চার দেয়ালে ঘেরা, শার্সি-দেওয়া বড়ো বড়ো দুটো জানলা দিয়ে দেখা যায় আঙিনা, আরেকটায় সরাসরি রাস্তা।

আমাদের ক্লাসের বিশেষ ভার পাওয়া নতুন মাস্টার স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন: 'যেখানেই আমি মাস্টারি করেছি, সেখানেই অবশ্য অবশ্যই সাহিত্যচক্র থেকেছে। বিশেষ করে এখানে, এই ক্লাসে তা থাকা উচিত আরও বেশি, যেখানে পড়ছে গ্লেব বরোদায়েভ।'

সবাই আমরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম শেষ বেঞ্চির মাঝখানটায়: ঘাড় গুঁজে সেখানে বসে আছে শান্তশিষ্ট গ্লেব।

চরিত্রটির বয়স বছর তেরো। মুখের নরম মখমলি চামড়া তার প্রায়ই লাল হয়ে ওঠে। মাথায় লম্বা নয়, পড়াশুনোয় মাঝারি, খুব ভালোবাসে কুকুর। খুবই সাধারণ গোছের দলামোচড়া প্যান্টটার দুই পকেট সর্বদাই ফুলে থাকে। অভিজ্ঞ চোখ নির্ভুল বলে দিতে পারবে যে তাতে আছে এক টুকরো রুটি কি সসেজ। গ্লেব তার প্রত্যেকটি প্রাতরাশ থেকে কুকুরের জন্যে কিছু-না-কিছু রেখে দেয় পকেটে। কুকুরেরাও সমান ভালোবাসত গ্লেবকে। আমরাও। শুধু কুকুর নয়, লোককেও ভালোবাসত সে। বিশেষ করে যদি কেউ বিপদে পড়ত। যেমন, পড়ে গিয়ে কারও যদি হাঁটুতে চোট লাগত, তাহলে গ্লেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বলত:

'এটা কী করে... তুই! বড়ো ইয়ে... আমি এক্ষুনি...'

উত্তেজিত হলে গ্লেব কখনও তার কথা শেষ করতে পারত না। বলতে গিয়েই সে থেমে যেত ঠিক একটা বিকল মোটর-ইঞ্জিনের মতো: গর গর করে উঠল, হঠাৎ থেমে গেল, আবার গর গর করে উঠল, আবার থেমে গেল... তবে আমরা জানতাম মিনিট খানেকের ভেতরেই গ্লেব এবার প্রথম-তলায় ওষুধঘর থেকে আয়োডিন নিয়ে আমাদের-তলার হাত ধোবার কল থেকে রুমাল ভিজিয়ে ছুটে আসবে।

বক্ষপিঞ্জরে ওর স্পন্দিত হত একটা কোমল হৃদয়।

'গ্লেব অবশ্য তোদের সকলের মতোই একজন ছাত্র,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ। 'তবে কিনা, ও হল লেখক বরোদায়েভের নাতি, যিনি এই আমাদের শহরেই এ শতকের প্রথমার্ধে লিখে গেছেন। গ্লেব যে ঠিক এই ইস্কুলেই পড়ছে তাতে আমি খুশি। আমার ধারণা একটি লেখকের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিলে সমস্ত সাহিত্যেই আগ্রহ বাড়বে। গ্লেব এক্ষেত্রে আমাদের অমূল্য সাহায্য দিতে পারে!'

ফের সবাই ফিরে তাকাল গ্লেবের দিকে... ওর দিকে মাত্র একজন তাকালেই সে সংকোচে কুঁজো হয়ে যায়। এখন তো একেবারে ডেস্কের তলে সেঁধোয় আর কী।

'সে কী করে...' আস্তে করে বললে সে, কথা শেষ করলে না, যেন পাশেই কারও হাঁটুতে চোট লেগেছে।

আমরা জানতাম যে আমাদের শহরে এক সময় গ্ল. বরোদায়েভ নামে এক লেখক ছিলেন। হলঘরে 'আমাদের শহরের নাম করা লোক' শীর্ষক বোর্ডে তাঁর একটা ছবিও আছে।

হঠাৎ টনক নড়ল আমার : 'ওঁরও নাম তাহলে গ্লেব!' শুধু আমরা জানতাম না যে ওই গ্লেব আমাদের গ্লেবের আপন ঠাকুর্দা। আমাদের গ্লেব কাউকে সে কথা কখনও বলেনি।

কিন্তু স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ গুপ্ত রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন... এ চরিত্রটির বয়স বছর উনষাট (উনি বলেছিলেন যে আমরা যদি স্বভাবচরিত্র মোটেই না-বদলাই, তাহলে এক বছর পর উনি আমাদের ছেড়ে পালাবেন পেনশন নিয়ে)। মাথায় লম্বা নন। চোখ দুটো ক্লান্ত, গাল সবসময় মসৃণ করে কামানো থাকে না, সে গালের ফ্যাকাশে রঙেও একই রকম ক্লান্তির ছাপ। তবে বাইরের চেহারাটা ওঁর ছলনা, ভেতরটা কর্মোদ্যোগে ভরা।

'আমাদের চক্রটায় আমরা গ্লেব বরোদায়েভের নাম দেব!' বলে উঠলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ। চোখ থেকে ওঁর ক্লান্তি মুছে গেছে।

'সে কী করে...' পেছনের বেঞ্চি থেকে আস্তে করে বললে গ্লেব, 'আমারও তো নাম... কেউ কেউ হয়তো ভাববে... অন্য ক্লাসের কেউ...'

একটা কথাও ও শেষ করলে না, তার মানে ভয়ানক বিচলিত হয়েছে।

'আরও তো আছেন...' বলে গেল সে, 'কেন ঠাকুর্দা... ধরুন গোগোল...'

'কিন্তু গোগোলের নাতি তো আর আমাদের ক্লাসে পড়ছে না,' আপত্তি করলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'পড়ছে বরোদায়েভের নাতি!'

সেই দিন থেকে গ্লেবের ডাকনাম জুটল 'বরোদায়েভের নাতি'। মাঝে মাঝে সংক্ষেপে 'নাতি' বলেও ডাকা হত।

সবখানেই ছেলেরা এক-একটা ডাকনাম বার করতে ভালোবাসে। কিন্তু মাস্টাররা যা বলেন, আমাদের ইস্কুলে তা 'হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপজ্জনক মহামারি'। কিন্তু বিপদ এতে

আছে-টা কী? আমার ধারণা, নামের চেয়ে ডাকনামে লোককে চেনা যায় অনেক ভালো। একটা মানুষ সম্পর্কে তার নামটা আদৌ কিছু বলে না। কিন্তু ডাকনামটা ঠিক করা হয় লোকটার স্বভাবচরিত্র দেখে। এইতো, আমায় যদি শুধু আমার নামে, 'আলিক' বলে ডাকা হয়, তাতে কী বোঝা যাবে আমার সম্পর্কে? কিন্তু ডাকনাম— 'ডিটেকটিভ'। সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে আমি কী ধরনের লোক।

একটু আফসোস যে কিছু কিছু ছেলে নামটাকে খানিক গুলিয়ে ফেলে 'ডিটেকটিভ'-এর বদলে চ্যাঁচায় 'ডিফেকটিভ'। সে-রকম ক্ষেত্রে আমি অবিশ্যি সাড়া দিই না।

'চক্রের কাজ কিন্তু ক্লাসের পড়াশুনার মতো হওয়া চলবে না। কেউ সেখানে পড়তে আসবে না,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ।

সঙ্গে সঙ্গেই সবার ইচ্ছে হল চক্রে ঢুকবে। কিন্তু মাথা তুলল অপ্রত্যাশিত বাধা।

'চক্রের কাজ হবে সৃষ্টি,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'সাহিত্যিক প্রতিভাই হবে ঢোকবার শর্ত।'

দেখা গেল তেমন গুণ ক্লাসের প্রায় কারও নেই। কবিতা লিখত শুধু আন্দ্রেই ক্রুগলভ, ডাকনাম যার 'দিনেমার প্রিন্স', আর গেন্কা রিজিকভ, ডাকনাম 'মরকুটে'।

প্রথম দৃষ্টিতে ডাকনামগুলো একটু আশ্চর্য মনে হবে, তবে সে শুধু লঘুচিত্ত প্রথম দৃষ্টিতেই।

কেননা হ্যামলেটের সঙ্গে ক্রুগলভের এমনিতে কোনো মিল নেই। তাহলেও তাকে যে ঠিক দিনেমার প্রিন্স বলেই ডাকা হয় তার কারণ কবিতা সে লিখত ইস্কুলের বিভিন্ন দিন উপলক্ষ্যে: শিক্ষাবর্ষ শুরুর দিন, শিক্ষাবর্ষ শেষের দিন, কারও জন্ম দিন, কারও মৃত্যু দিনে।

আমাদের ইস্কুলের যখন দশ বছর পূর্ণ হয়, তখন সে লেখে:

এই যে দিনে পালন করি
বিদ্যালয়ের জয়ন্তী,
ব্যাকুল হয়ে স্মরণ করি,
আনন্দ আজ অগুন্তি।

একবার পয়লা সেপ্টেম্বর স্কুল খোলার সময় পাইয়োনিওর নেতা আমাদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে প্রিন্সের কবিতা শুনিয়েছিল:

এই যে দিনে শুরু করছি
জ্ঞানবিদ্যার পথ যে,
ব্যাকুল হয়ে চেয়ে দেখছি
নীল আকাশের সূর্যে!

আর শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে গ্রীষ্মের ছুটি হবার আগে দেয়াল পত্রিকায় দেখা গেল দিনেমার

Глеб
Бородаев